মুহাসাবা বা আত্মপর্যালোচনা : প্রয়োজন ও পদ্ধতি

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অনুবাদ : আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ محاسبة النفس : أهميته وطريقته ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ محمد تقي عثماني

ترجمة: علي حسن طيب

مراجعة: الدكتور محمد منظور إلهي

2012 - 1433

IslamHouse.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মুহাসাবা বা আত্মপর্যালোচনা : প্রয়োজন ও পদ্ধতি

মৃত্যু সুনিশ্চিত বিষয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يوم لا تخفى عليكم خافية.

'তোমাদের কাছে হিসাব চাওয়ার আগে নিজেরাই নিজেদের হিসাব সম্পন্ন করে নাও, তোমাদের আমল ওজন করার আগে নিজেরাই নিজেদের আমলসমূহ ওজন করে নাও, কিয়ামত দিবসে পেশ হওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করো। সুসজ্জিত হও সেদিনের জন্য, যেদিন তোমাদের সামনে কোনো কিছু অস্পষ্ট থাকবে না।'

মায়মূন ইবন মিহরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لاَ يَكُونُ العَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ.

‘সে অবধি কোনো ব্যক্তি মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু হতে পারবে না যাবৎ সে নিজেই নিজের হিসেব নেয় বা মুহাসাবা করে। যেভাবে সে তার সঙ্গীর সঙ্গে হিসেব করে কোথায় তার আহার আর কোথায় তার পোশাক।’

মৃত্যু আসবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। নেই কোনো দ্বিধা বা সংশয়। এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করে নি। মানুষ আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, রাসূলকে অস্বীকার করেছে, কিন্তু মৃত্যুকে কেউ অস্বীকার করতে পারে নি। পৃথিবীতে আসলে একদিন যেতে হবে, মৃত্যুর তেতো স্বাদ নিতে হবে এ কথা সবাই মানে। আবার এ ব্যাপারেও সবাই একমত, ‘মৃত্যুর কোনো সুনির্দিষ্ট সময় নেই। হতে পারে মৃত্যু এখনই এসে পড়বে কিংবা এক মিনিট, এক ঘন্টা, একদিন, এক সপ্তাহ অথবা এক বছর পর আসবে। কোনো নিশ্চয়তা নেই। বিজ্ঞানের গবেষণা উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছলেও ‘কে কখন কোথায় মরবে’ এ তথ্য দিতে পারছে না।

মৃত্যুর পূর্বেই মরার ব্যাখ্যা

মৃত্যুর আগমন যেহেতু সন্দেহাতীত, এর দিন-ক্ষণ জানাও সাধ্যাতীত, তাই অপ্রস্তুত অবস্থায় যদি কেউ মারা যায়, আল্লাহ জানেন ওপারে সে কোনো অবস্থার সম্মুখীন হবে। এমন যেন না হয়, ওপারে পৌঁছে

আল্লাহর আযাব বা ক্রোধের মুখে পড়তে হয়। অসন্তোষ বা অশান্তির মুখোমুখি হতে হয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সাহাবী বলেন, এই রুঢ় বাস্তব 'মৃত্যু' আসার পূর্বেই মরো।

কিভাবে মরবে? মরার আগে মরার ব্যাখ্যা কী? উলামায়ে কেরাম এর দু' রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এক. প্রকৃত মৃত্যু আগমনের পূর্বে আল্লাহর নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক এবং এর পরিপন্থি মনের সকল কামনা-বাসনা এবং পাপ, নাফরমানী ও অবৈধ কাজ করার যে চাহিদা সৃষ্টি হয়, সব কিছুকে পদদলিত ও মথিত করে দাও। ধ্বংস ও বিনাশ করে দাও। দুই. মরণের আগে মরণের চিন্তা ও ধ্যান করো। চিন্তা করো, একদিন আমাকে এ জগৎ ছেড়ে যেতে হবে খালি ও রিক্ত হাতে। টাকা-পয়সা সাথে যাবে না। সন্তানাদি, কুঠি-বাংলো, বন্ধু-বান্ধব কেউ সাথে যাবে না, বরং যেতে হবে একাকী, শূন্য হাতে। এসব একটু ভেবে দেখো।

বাস্তব কথা হলো, পৃথিবীতে আমাদের মাধ্যমে যত অনাচার, পাপাচার সংঘটিত হয়, গুনাহ নাফরমানী প্রকাশ পায় এর বড় কারণ হলো, 'মৃত্যুকে ভুলে যাওয়া'। যতদিন শরীরে শক্তি আছে, স্বাস্থ্য ভালো আছে, হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সচল আছে, ততদিন মানুষ নিজেকে সর্বেসর্বা ভাবে। আকাশ কুসুম কল্পনা ফাঁদে। অহংকার ও আত্মগৌরব করে। অন্যের ওপর জুলুম করে। অপরের অধিকার হরণ করে। মানুষ এসব

যৌবনকালে অবলীলায় করতে থাকে। ‘তাকে একদিন মরতে হবে’ এ কথা তার কল্পনাতেই আসে না। আপনজনের জানাযা বহন করে, নিজ হাতে প্রিয়জনকে কবরস্থ করে, তবুও ভাবনার পরিবর্তন হয় না। মনে করে, সেই তো মরেছে, আমি তো আর মরি নি। এভাবে উদাসীনতা ও অন্যমনস্কতার ভেতর দিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়, ফলে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পায় না।

দু’টি বড় নেয়ামত ও আমাদের উদাসীনতা

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ » .

‘আল্লাহর দেয়া দু’টি নেয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ লোকই প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। এক. সুস্থতার নেয়ামত। দুই. অবসরের নেয়ামত।[1]

মনে হয় ‘সুস্থতার নেয়ামত চিরকালই অক্ষুন্ন থাকবে’। ফলে সুস্থকালে পুণ্য ও নেকীর কাজের তাগাদা বোধ হয় না। কাল করব, পরশু করব- এভাবে পেছায়। এক সময় নেয়ামত ফুরিয়ে যায়। অনুরূপভাবে ‘অবসর

---

[1]. বুখারী : ৬৪১২; তিরমিযী : ২৩০৪।

বা সুযোগ’ নেয়ামতেরও মূল্যায়ন করা হয় না। এখন কাজ করার সময় ও সুযোগ আছে; কিন্তু মানুষ ভালো কাজ করে না এ ভেবে যে, এখনো সময় আছে; পরে করে নেব ইত্যাদি।

যৌবন এখনো অটুট আছে, তারুণ্যের ইস্পাত শক্তি বলে বলবান তরুণ পাহাড়-পর্বত বয়ে নিয়ে যেতে পারে। অনেক শ্রম ও কষ্টসাধ্য কাজ করতে পারে। চাইলে এই যৌবনে অনেক ইবাদত করতে পারে। আল্লাহর পথে ত্যাগ ও সাধনা করতে পারে। সৃষ্টির সেবা করতে পারে। আল্লাহকে খুশি করার জন্য আমলমানায় নেকীর স্তুপ গড়তে পারে। কিন্তু মস্তিষ্কে এ কথা বসে গেছে, আমি এখনো যুবক আছি, এখন একটু যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করি। ইবাদত-বন্দেগী ও নেক কাজ করার জন্য সারা জীবন পড়ে আছে। এগুলো পরে করবো। এভাবে সে নেক কাজ টলাতে থাকে। যৌবন কখন শেষ হয়ে যায় তা টেরই পায় না। দুর্বল হয়ে পরে। ফলে ইবাদত ও নেক কাজ করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর করতে পারে না। কারণ এখন তার দেহে শক্তি নেই। স্বাস্থ্য ভালো নেই। অবসরের সংকট ও কাজের ব্যস্ততা এতো বেশি যে, এসবের জন্য সময়ই বের করতে পারে না। এর একমাত্র কারণ হলো, মানুষ মৃত্যু থেকে উদাসীন। মৃত্যুর কথা স্মরণ করে না।

শায়খ বাহলুল রহ. -এর শিক্ষামূলক ঘটনা

বাদশা হারুনুর রশীদের আমলে 'বাহলুল' নামক বড় এক আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহর মহব্বতে পাগল এ বুযুর্গের সাথে বাদশা হাস্য-কৌতুক করতেন। পাগল হলেও জ্ঞানী সুলভ কথা বলতেন। বাদশা তার প্রহরীকে বলে রেখেছিলেন, এ ব্যক্তিটি আমার সাক্ষাতে যখনই আসতে চায়, তখনই তাকে আসতে দিও। সুতরাং যখন খুশি তিনি রাজ দরবারে হাজির হতেন।

একদিন তিনি দরবারে প্রবেশ করে বাদশা হারুনুর রশীদের হাতে একটি ছড়ি দেখতে পেলেন। হারুনুর রশীদ কৌতুক করে বললেন, 'বাহলুল সাহেব তোমার কাছে একটা অনুরোধ রাখব'। বাহলুল বললেন, কী অনুরোধ? হারুনুর রশীদ তাকে ছড়িটি দিয়ে বললেন, 'এটা তোমাকে আমানত স্বরূপ দিচ্ছি'। পৃথিবীর বুকে তোমার চেয়ে বড় কোনো বেকুব যদি খুঁজে পাও তাকে আমার পক্ষ থেকে এটি উপহার দেবে।' 'আচ্ছা ঠিক আছে' বলে ছড়িটি বাহলুল নিজের কাছে রেখে দিল। আসলে বাদশা ঠাট্টা করে বাহলুলকে এটাই বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তোমার চেয়ে বড় নির্বোধ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। যা হোক তখনকার মতো বাহলুল ছড়ি নিয়ে দরবার থেকে চলে গেল।

কয়েক বছর পরের ঘটনা। একদিন বাহলুল জানতে পারল, হারুনুর রশিদ খুব অসুস্থ, শয্যাশায়ী। তাঁর চিকিৎসা চলছে, কিন্তু কোনো ফল

দিচ্ছে না। বাহলুল বাদশার শুশ্রুষার জন্য তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমিরুল মুমিনীন কেমন আছেন?' বাদশা বললেন, 'অবস্থা আর কি, সামনে সুদূর সফর উপস্থিত'।

- বাহলুল জিজ্ঞেস করল, 'কোথাকার সফর?'

- আখেরাতের সফর! এখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি।

- কতদিন পর ফিরে আসবেন?

- আরে ভাই! এটাতো আখেরাতের সফর। এ সফরে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না।

- আচ্ছা আপনি তো এ সফর থেকে আর ফিরবেন না, তাই সফরে আরাম ও সুবিধার জন্য কী কী ব্যবস্থা করেছেন?

- তুমি দেখি আবার নির্বোধের মত কথাবার্তা বলতে শুরু করেছ। আখেরাতের সফরে কেউ সঙ্গে যেতে পারে নাকি? এ সফরে বডিগার্ড, সৈন্য-লশকর কেউ সাথে যেতে পারে না। সঙ্গীহীন একাকী যেতে হয়। এ এক মহা সফর।

- এত দীর্ঘ সফর! সেখান থেকে আর ফিরবেন না, তবুও সৈন্য-সামন্ত কিছু পাঠালেন না? অথচ ইতোপূর্বে সব সফরেই এর যাবতীয়

ব্যবস্থাপনার জন্য আগে থেকেই আসবাব-পত্র ও সৈন্য-সামন্ত প্রেরণ করতেন। এ সফরে কেন পাঠালেন না?

- এটা এমন সফর যে, এতে সৈন্য পাঠানো যায় না।

- জাঁহাপনা! বহুদিন হলো আপনার একটি আমানত আমার কাছে রয়ে গেছে। সেটি একটি ছড়ি। আমার চেয়ে বড় কোনো নির্বোধ পেলে এটা তাকে উপহার দিতে বলেছিলেন। আমি অনেক খুঁজেছি কিন্তু আপনার চেয়ে বড় নির্বোধ আর কাউকে পেলাম না। কারণ, আমি দেখেছি আপনি কোনো সংক্ষিপ্ত সফরে গেলেও মাস খানেক পূর্ব থেকেই তার প্রস্তুতি চলত। পানাহারের আসবাব, তাবু, সৈন্য, বডিগার্ড ইত্যাদি আগে থেকেই পাঠানো হতো। আর এখন এতো দীর্ঘ সফর, যেখান থেকে ফেরার সম্ভাবনাও নেই, অথচ এর জন্য কোনো প্রস্তুতি নেই। আপনার চেয়ে বড় বোকা জগতে আর কে আছে? অতএব আপনার আমানত আপনাকেই ফেরৎ দিচ্ছি। এসব শুনে বাদশা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বিলাপ করে বলতে লাগলেন, বাহলুল! তুমি সঠিক বলেছো। আজীবন তোমাকে বোকা ভেবেছি, কিন্তু বাস্তবতা হলো তুমি বুদ্ধিমান। তুমি প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলেছ। বাস্তবেই আমি সারা জীবন বৃথা কাটিয়েছি। আখেরাতের কোনো প্রস্তুতি নেই নি।

প্রকৃত জ্ঞানী কে?

বাহলুল যা বলেছেন, তা একটি হাদীসের মর্মকথা। শাদ্দাদ ইবন আউস রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

« الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ ».

‘প্রকৃত জ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য নেক কাজ করেছে। আর অক্ষম সেই যে নিজের নফসকে প্রবৃত্তির পেছনে পরিচালিত করে এবং আল্লাহর কাছে কেবল প্রত্যাশা করে।’[2]

হাদীসে নফসকে নিয়ন্ত্রণের অর্থ হলো, কিয়ামতের দিন হিসাব নেয়ার আগে দুনিয়ায় নিজেই নিজের হিসেব নেয়া তথা মুহাসাবা করা।

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘প্রকৃত জ্ঞানী’র পরিচয় দিয়েছেন। অথচ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে বেশি অর্থ উপার্জন করতে

---

[2]. তিরমিযী : ২৪৫৯; তাবরানী, মু‘জামুল কাবীর : ৬৯৯৫; মুসতাদরাক আলাস-সাহীহ : ৭৬৩৯; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটিকে হাসান সহীহ, তবে বুখারী ও মুসলিম এটি সংকলন করেন নি। তালখীস নামক গ্রন্থে ইমাম যাহবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

পারে, টাকা থেকে টাকা কামাই করতে পারে, দুনিয়াকে বোকা বানিয়ে দিতে পটু, তাকেই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানি মনে করা হয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসে বলেছেন, প্রকৃত জ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফস তথা মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং প্রবৃত্তির সকল চাহিদার পেছনে না চলে নফসকে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগামী বানায়, মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এর ব্যতিক্রম হলে সে নির্বোধ-বোকা। কারণ সে সারাটা জীবন অর্থহীন কাজে ব্যয় করল কিন্তু চিরকাল যেখানে থাকতে হবে তার জন্য কোনো পাথেয় সংগ্রহ করল না।

আমরা সবাই বোকা

হারুনুর রশীদকে বাহলুল যা বলেছেন, গভীরভাবে চিন্তা করলে আমাদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য বলে মনে হবে। পৃথিবীতে বসবাসের জন্য সবাই চিন্তা করে, সে কোথায় বাড়ি বানাবে? কেমন গৃহ নির্মাণ করবে? সুখ ও বিলাসিতার কী কী উপকরণ সংগ্রহ করবে? কোথাও ভ্রমণে গেলে 'সিট পায় কি না' এই ভয়ে আগেই টিকিট বুকিং করে, প্রস্তুতি শুরু করে। যেখানে যাচ্ছে সেখানে সংবাদ পাঠায়। হোটেলে বুকিং করায়। মাত্র তিন দিনের সফরেও এসব প্রস্তুতি নেয়া হয়।

অথচ যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে, যে জীবনের শুরু আছে শেষ নেই, তার কোনো চিন্তাই করে না যে, সেখানে কেমন ঘর নির্মাণ করবে? সেখানকার জন্য কিভাবে বুকিং করবে?

উপরোক্ত হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তি সেই, যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়। অন্যথায় সে হলো বেকুব। চাই সে যতবড় বিত্তশালী বা পুঁজিপতিই হোক না কেন। আর আখেরাতের প্রস্তুতির পথ এটিই যে, 'মৃত্যুর আগেই মৃত্যুর ধ্যান করবে'। এ কথা চিন্তা করবে যে, 'একদিন আমাকে মরতে হবে'।

মৃত্যু এবং আখেরাতের মুহাসাবা বা কল্পনা করার পদ্ধতি

সারাদিনের মধ্যে একটি নির্জন-নিভৃত সময় বের করে এভাবে কল্পনা করা, 'আমার অন্তিম মুহূর্ত এসে গেছে, জান কবজ করার জন্য ফেরেশতারা উপস্থিত হয়েছেন, আমার জান বের করেছে, আত্মীয়-স্বজন গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থায় লেগে গেছে, কাফন পরিয়ে নিয়ে গেছে, জানাযার নামায পড়ে কবরে রেখেছে, অতঃপর কবর বন্ধ করে দিয়েছে, ওপর থেকে মাটি দিয়ে সেখান থেকে চলে গেছে, অন্ধকার কবরে এখন আমি একা, শুধুই একা। অতঃপর ফেরেশতাগণ এসে প্রশ্নোত্তর শুরু করেছে।'

এরপর আখেরাত কল্পনা করা যে, ‘আমাকে কবর থেকে পুনরায় উঠানো হয়েছে, হাশরের মাঠ কায়েম হয়েছে, সব মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছে, সেখানে প্রচণ্ড গরম লাগছে, দরদর করে ঘাম বয়ে পড়ছে, সূর্য একেবারে নিকটে এসেছে, সবাই দুশ্চিন্তা ও টেনশনে ভুগছে, তখন তারা নবীগণের কাছে গিয়ে হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার আবেদন করছে।’

এভাবে হিসাব-কিতাব, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির কল্পনা করা। রোজ ফজরের পর কুরআন তেলাওয়াত, মাসনূন দু‘আ এবং যিকির-আযকার শেষ করে কিছুক্ষণ চিন্তা করা, এ সময় অবশ্যই আসবে। জানা নেই কখন আসবে। হতে পারে এখনই আসবে, আজই আসবে। এসব কল্পনা করে দু‘আ করা, ‘হে আল্লাহ, আমি দুনিয়াবী কাজ-কর্মের জন্য বের হচ্ছি। আমার দ্বারা যেন এমন কোনো কাজ সংঘটিত না হয়, যা আমার আখেরাতকে বরবাদ ও ধ্বংস করে দেয়।’

প্রতিদিন এভাবে ধ্যান করতে থাকা। একবার যদি মৃত্যুর চিন্তা অন্তরে বসে যায়, তাহলে আত্মশুদ্ধির দিকে মনযোগ যাবে এবং আখেরাতের চিন্তা মাথায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

আব্দুর রহমান ইবন আবী নয়ীম রহ.

আব্দুর রহমান ইবন আবী নয়ীম রহ. একজন বড় বুযুর্গ মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর জীবনকালে এক ব্যক্তি মনে মনে ভাবলো, আমি বিভিন্ন আলেম, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বুযুর্গের কাছে প্রশ্ন করব যে, যদি জানতে পারেন 'আগামীকাল আপনার মৃত্যু হবে'। জীবনের শুধুমাত্র একদিন বাকি আছে। তবে আপনারা কীভাবে সে দিনটি কাটাবেন? প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁরা যেসব ভালো ভালো কাজের কথা বলবেন, তা সে নিজেও করবে। অতঃপর তাঁদেরকে প্রশ্ন করে বিভিন্ন আমলের কথা জানতে পারলেন।

এক পর্যায়ে যখন শায়খ আবদুর রহমান ইবন আবী নয়ীম রহ. এর কাছে গিয়ে এ প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন, প্রতিদিন যে কাজ করি সেদিনও তাই করব। কারণ, আমি প্রথম দিন থেকেই নিজের কর্মসূচী ও কাজের রুটিন এ ধারণাকে সামনে রেখে বানিয়ে নিয়েছি যে, 'হতে পারে এটাই আমার জীবনের শেষ দিন'। 'হতে পারে আজই আমার মরণ এসে পড়বে'। এই সূচিতে পরিবর্তন বা সংযোজন করার মত কোনো সুযোগ নেই। প্রতিদিন যা করি জীবনের শেষ দিনও তাই করব।

এটাই হলো "মূ-তূ ক্ববলা আন তা মূ-তূ"বা 'মরার আগেই মরো'র বাস্তব নমুনা। এসব মহা মনীষী মৃত্যুর চিন্তা ও আখেরাতের খেয়াল দ্বারা

নিজের জীবন এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছিলেন যে, সর্বক্ষণ মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। মৃত্যু যখনই আসতে চায় আসুক।

প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা

উবাদা ইবন ছামিত রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

« مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » . قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ . قَالَ « لَيْسَ ذَاكَ ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَىْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ ، فَلَيْسَ شَىْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ »

‘যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে পছন্দ করে, আল্লাহর মিলন প্রত্যাশী হয়, আল্লাহ তা‘আলাও তার সাক্ষাতে আগ্রহী হন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাতকে অপ্রিয় ভাবে, আল্লাহও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।’ এ কথা শুনে আয়েশা কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য কোনো স্ত্রী বললেন, আমরা তো মৃত্যু অপ্রিয়ই জ্ঞান করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটা নয়; বরং ব্যাপার হলো, যখন মু'মিনের সামনে মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর পুরস্কারের সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন তার কাছে কোনো জিনিসই এর চেয়ে প্রিয় মনে হয় না। ফলে সে আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করে আর আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে কাফের ব্যক্তির সামনে যখন মৃত্যু উপস্থিত, তখন তাকে আল্লাহর শাস্তি ও আযাবের দুঃসংবাদ শোনানো হয়, এমতাবস্থায় তার কাছে এর চেয়ে অপ্রিয় আর কিছু মনে হয় না। ফলে সে আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে আর আল্লাহও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।[3]

সুতরাং এমন সৌভাগ্যবান প্রকৃত মু'মিন মাত্রেই সর্বদা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকেন। তাদের অবস্থাই যেন এ কথা বলছে কবি যেমন বলেন,

কালকে আমার মিলন হবে বন্ধুসনে,

দেখব আমি নবী ও তাঁর সঙ্গীগণে।

অর্থাৎ, আগামীকাল আপন প্রিয়জন তথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাত হবে। এই মৃত্যু চিন্তার

---

[3]. বুখারী : ৬৫০৭; মুসলিম : ৪৮৪৪।

প্রভাবেই মানুষের জীবন সুন্নত ও শরীয়তের রাজপথে উঠে আসে এবং তাকে সর্বক্ষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রাখে।

যা হোক প্রতিদিন কিছু সময় বের করে মৃত্যুর কল্পনা করতে হবে। ভাবতে হবে 'মৃত্যু আসছে, আমি কি প্রস্তুত হয়েছি?'

আজই নিজের হিসাব কষে নিতে হবে

আলোচ্য বাণীর দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে, কিয়ামত দিবসে হিসাব গ্রহণের আগেই তুমি তোমার হিসাব নাও। আখেরাতে প্রতিটি কর্মের হিসাব নেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]

'অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালোকাজ করলে তা সে দেখবে, আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখবে'। {সূরা আয-যিলযাল, আয়াত : ৭-৮}

অর্থাৎ, তোমরা যে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছ তা সামনে আসবে, আর যে মন্দ কাজ করেছ তাও সামনে উপস্থিত পাবে। কবি খুব সুন্দর করে বলেছেন,

প্রতিদান দিবসেতে হবে যা

আজই হয়েছে বলে ভাব তা।

‘কিয়ামতের দিন হিসাব নেয়ার আগেই নিজের হিসাব নেয়া শুরু করো’ প্রত্যহ রাতে মনকে জিজ্ঞেস করো, আজ সারাটা দিন এমন কী কী কাজ করেছি, যে ব্যাপারে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হলে আমি উত্তর দিতে পারব না। এভাবে প্রতিদিন করতে থাক।

সাতসকালে মনের সঙ্গে অঙ্গীকার

ইমাম গাযালী রহ. মুহাসাবা ও আত্মশুদ্ধির এক বিরল ও বিস্ময়কর পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। আমরা এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে তা অব্যর্থ প্রতিষেধক হিসেবে কাজ দেবে। এ থেকে আর কোনো ভালো পদ্ধতি পাওয়া মুশকিল।

সেটি হলো প্রতিদিন কয়েকটি কাজ করবে। প্রথম কাজ হলো, ‘সকালে ঘুম থেকে জেগে নফসের কাছে এ মর্মে অঙ্গীকার নেবে যে, আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো গুনাহ করব না। আমার দায়িত্বে যত ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নাত আছে সব ঠিকমত আদায় করব। আমার ওপর আল্লাহর যত হক আছে, বান্দার হক আছে সব পুরোপুরি আদায় করব। হে নফস! মনে রেখ, ভুলক্রমে অঙ্গীকারের বিপরীত কোনো কাজ

করলে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।' এই হলো প্রথম কাজ এর নাম দিয়েছেন তিনি 'মুশারাতা' বা 'আত্ম অঙ্গীকার'।

অঙ্গীকারের পর দু'আ

ইমাম গাযালী রহ. এর কথার সাথে একটু সংযোগ করে বলা যায়, এই 'আত্ম অঙ্গীকারের' পর আল্লাহর কাছে দু'আ করা, 'হে আল্লাহ, আজ আমি গুনাহ করব না বলে অঙ্গীকার করেছি। আমি সব ফরজ, ওয়াজিব আদায় করব। শরীয়ত অনুযায়ী চলবো। হুকুল্লাহ এবং হুকুকুল ইবাদ সঠিকভাবে আদায় করবো। কিন্তু ইয়া মাবুদ, আপনার তাওফীক ছাড়া এই প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু আমি পণ করেছি, তাই আপনি আমাকে তাওফীক দিন। আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা থেকে রক্ষা করুন। পুরোপুরিভাবে এ প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পুরো দিন নিজের আমলের 'মুরাকাবা'

এ দু'আ করে জীবিকার জন্য বেরিয়ে যাও। চাকরি করলে চাকরিতে, ব্যবসা করলে ব্যবসায়, দোকান করলে দোকানে চলে যাও। সেখানে গিয়ে এই কাজ করো যে, প্রতিটি কাজ শুরু করার আগে একটু ভেবে দেখ, এই কাজটি প্রতিজ্ঞার খেলাফ কি-না। এই শব্দ যা উচ্চারণ করছি

তা প্রতিজ্ঞা পরিপন্থী কি-না। যদি প্রতিজ্ঞা পরিপন্থী মনে হয় তাহলে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করো। এটাকে তিনি বলেছেন 'মুরাকাবা'। এটাই হলো দ্বিতীয় কাজ।

শোয়ার আগে 'মুহাসাবা'

তৃতীয় কাজটি করতে হবে শোয়ার আগে, আর তা হলো 'মুহাসাবা' অর্থাৎ নফসকে বলবে, তুমি সারাদিন গুনাহ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। প্রতিটি কাজ শরিয়তমত করবে। হুকুকুল্লাহ তথা আল্লাহর হক ও হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হক ঠিক মত আদায় করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। এখন বলো কোন কাজ তুমি প্রতিজ্ঞামত করেছ, আর কোন কাজ প্রতিজ্ঞামত কর নি? এভাবে সারাদিনের সকল কাজের হিসাব গ্রহণ করবে। সকালে যখন বাড়ি ত্যাগ করলে তখন অমুক লোককে কি বলেছ? চাকরি ক্ষেত্রে গিয়ে নিজ দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছ? ব্যবসা কীভাবে পরিচালনা করেছ? হালালভাবে না হারাম পদ্ধতিতে? যত লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের হক কিভাবে আদায় করেছ? বিবি, বাচ্চার হক কিভাবে আদায় করেছ? এভাবে যাবতীয় কাজের হিসাব নেয়াকে 'মুহাসাবা' বলা হয়।

অতঃপর শুকরিয়া আদায় কর

এই ‘মুহাসাবা’র ফলাফল যদি এই হয় যে, ‘সকালের প্রতিজ্ঞায় তুমি সফল’ তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। বলো, হে আল্লাহ! তোমার অশেষ শুকরিয়া যে, তুমি আমাকে প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকার তাওফীক দিয়েছ। (আল্লহুম্মা লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকুর) শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ তা‘আলা তা বৃদ্ধি করে দেন। তাই আগামী দিনেও প্রতিজ্ঞায় অটল থাকার তাওফীক দেবেন।

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

﴿ وَإِذۡ تَأَذَّنَ رَبُّكُمۡ لَئِن شَكَرۡتُمۡ لَأَزِيدَنَّكُمۡۖ وَلَئِن كَفَرۡتُمۡ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٞ ٧ ﴾ [ابراهيم: ٧]

‘আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, ‘যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন’। {সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৭}

অতএব প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকার এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে ভবিষ্যতে নেয়ামত বৃদ্ধি করা হবে এবং অতিরিক্ত নেকীও অর্জন হবে।

অন্যথায় তাওবা কর

‘মুহাসাবা’র ফলাফল যদি এই দাঁড়ায় যে, অমুক স্থানে প্রতিজ্ঞার পরিপন্থী কাজ করেছো, অমুক সময় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছো, পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছো এবং স্বীয় কৃত প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকতে পারো নি, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাওবা করো, বলো, ‘হে আল্লাহ! আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায়, প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকতে পারিনি। হে মাবুদ! আমি তোমার কাছে তাওবা করছি এবং ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি আমার তাওবা কবুল করে আমার পাপ মাফ করে দাও। ভবিষ্যতে আমাকে প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকার তাওফীক দান করো।

নফসকে শাস্তি প্রদান কর

তাওবার সাথে সাথে নফসকে একটু শাস্তিও দাও। নফসকে বলো, তুমি প্রতিজ্ঞার খেলাফ কাজ করেছ, সুতরাং শাস্তি স্বরূপ তোমাকে আট রাকাত নফল সালাত আদায় করতে হবে। এ শাস্তিটা প্রভাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার সময়ই নির্ধারণ করো। সুতরাং রাতে নফসকে বলবে, তুমি নিজের সুখ-শান্তির জন্য, সামান্য আনন্দ উপভোগের জন্য আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে লিপ্ত করেছ। অতএব এখন তোমাকে সাজা ভোগ করতে হবে। তোমার শাস্তি হলো, এখন শোয়ার আগে আট রাকাত

নফল সালাত আদায় করো। তারপর বিছানায় যাও। এর আগে বিছানায় যাওয়া নিষেধ।

শাস্তি হওয়া চাই পরিমিত ও ভারসাম্যপূর্ণ

আমার সম্মানিত উস্তাদ বলতেন, এমন শাস্তি নির্ধারণ করো যা হবে ভারসাম্যপূর্ণ, সঙ্গতিপূর্ণ ও পরিমিত। এতো বড় ধরনের শাস্তি দিও না যে, নফস বিগড়ে যায়। আবার এতো ছোট ও হালকা শাস্তি দিও না যে, তাতে নফসের কোনো কষ্টই না হয়।

হিন্দুস্তানে স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে নিয়ম করলেন, প্রত্যেক ছাত্রকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করতে হবে। যারা সালাতে অনুপস্থিত থাকবে তাদের জরিমানা দিতে হবে। এক ওয়াক্ত সালাতের জরিমানা সম্ভবত এক আনা নির্ধারণ করা হয়েছিল। ফল দাঁড়ালো উল্টা। যেসব ছাত্রের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল, তারা এক মাসের সব সালাতের জরিমানা অগ্রিম জমা দিয়ে বলতো, এই হলো এক মাসের সমুদয় সালাতের জরিমানা। সুতরাং একমাস সালাত আদায় থেকে ছুটি।

তিনি রহ. বলতেন, এত অল্প ও মামুলি অর্থদণ্ড হওয়া সমীচীন নয়, যা একেবারেই জমা দিতে পারে। আবার এত বেশি হওয়াও ঠিক নয় যে,

মানুষ তা থেকে পলায়ন করে। বরং মধ্যম ধরনের ও ভারসাম্যপূর্ণ শাস্তি নির্ধারণ করা উচিৎ। উদাহরণ স্বরূপ যেমন আট রাকাত নফল সালাত শাস্তি নির্ধারণ করা একটি ভারসাম্যপূর্ণ সাজা।

একটু সাহস করতে হবে

মোটকথা, আত্মশুদ্ধি করতে হলে হাত-পা নাড়াতে হবে, একটু একটু হিম্মৎ করতে হবে, কমবেশি কষ্ট সহ্য করতে হবে এবং এর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও দুরন্ত ইচ্ছা করতে হবে। শুধু ঘরে বসে বসে নফসের তাযকিয়া ও পরিশুদ্ধি হতে পারে না। তাই শাস্তি নির্ধারণ করে নাও যে, নফস ভুল পথে গেলে আট রাকাত নফল সালাত তাকে অবশ্যই পড়তে হবে। নফস যখন বুঝতে পারবে যে, আট রাকাত নফল পড়ার নতুন আপদ খাড়া হয়েছে, তখন সে ভয়ে গুনাহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। নিজের নফস এভাবে আস্তে আস্তে সঠিক পথে উঠে আসবে। ভবিষ্যতে আর তোমাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করবে না ইনশাল্লাহ।

করতে হবে শুধু চারটি কাজ

ইমাম গাযালী রহ. -এর উপদেশের সার সংক্ষেপ হলো, ‘মাত্র চারটি কাজ করো’। এক. সকালে মোশারাতা বা আত্ম অঙ্গীকার। দুই. সব

কাজের সময় মুরাকাবা। **তিন**. রাতে শোয়ার আগে মুহাসাবা। **চার**. নফস প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে মো'য়াকাবা বা শাস্তি প্রদান।

ধারাবাহিকভাবে এ আমল করে যেতে হবে

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, শুধু দু'চারদিন এ আমল করে এ কথা ভাবা উচিৎ নয় যে, ব্যাস আমি পূর্ণতায় পৌঁছে গেছি, আমি বুযুর্গ হয়ে গেছি। বরং ধারাবাহিকভাবে এ আমল করে যেতে হবে। কখনো তুমি নফসের ওপর বিজয়ী হবে আবার কখনো শয়তান বিজয়ী হবে। কিন্তু এতে ঘাবড়ালে চলবে না। আমল ছেড়ে দেয়া যাবে না। কারণ, এতে আল্লাহর কোনো রহস্য ও হেকমত লুকায়িত থাকতে পারে। ইনশাআল্লাহ এভাবে জয়-পরাজয় ও উন্নতি-অবনতির পথ ধরে একদিন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

এ আমল করে প্রথম দিনই যদি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাও, তবে 'আমি অনেক বড় কিছু বনে গেছি'- এ ধরনের আত্মতুষ্টি বা হামবড়া ভাব তোমাকে বিভ্রান্ত করবে। সুতরাং এ আমলে কখনো সফলতা আবার কখনো ব্যর্থতার দেখা মিলবে। যেদিন সফলতা আসবে, সেদিন শুকরিয়া আদায় করবে। যেদিন ব্যর্থতা আসবে, সেদিন তওবা-ইস্তেগফার করবে। নিজের নফসের ওপর শাস্তি জারি করবে এবং

নিজের খারাপ আমলের ব্যাপারে অনুতাপ ও অনুশোচনা প্রকাশ করবে। ‘এ অনুতাপ মানুষকে নিম্ন থেকে অনেক উচ্চে পৌঁছিয়ে দেয়’।

অনুশোচনা ও তওবা দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

মানুষ যদি আপন কৃতকর্মের প্রতি খাঁটি মনে অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তার এত বেশি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন, যার কল্পনাই সে করতে পারে না।

শায়খ আবদুল হাই রহ. বলতেন, যখন কোনো বান্দা পাপ করে আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন আল্লাহ তা‘আলা সেই বান্দাকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি যে ভুল করে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছ, যা তোমাকে আমার সাত্তার (দোষ গোপনকারী) গাফফার (ক্ষমাশীল) ও রহমান (দয়াশীল) গুণের আশ্রয়প্রার্থী বানিয়েছে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলবাহী বনে গেল।

হাদীসে এসেছে, ঈদের দিনে আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাদের কাছে স্বীয় ইজ্জত ও জালাল তথা মর্যাদা ও মাহত্মের শপথ করে বলেন, আজ এসব লোকেরা সমবেত হয়ে কর্তব্য পালন করছে। আমাকে ডাকছে, ক্ষমা প্রার্থনা করছে এবং কাঙ্ক্ষিত বস্তুর আবেদন জানাচ্ছে। আমার

ইজ্জত ও জালালের কছম, আমি তাদের দু'আ কবুল করব। তাদের গুনাহসমুহকে নেকী দ্বারা বদলে দেব।

যেমন আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, (দীর্ঘ হাদীসের শেষের দিকে গিয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ বলেন,

« فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَقِيَامَهُ رِضَائِي وَمَغْفِرَتِي، وَيَقُولُ: يَا عِبَادِي، سَلُونِي فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ شَيْئًا فِي جَمْعِكُمْ لِآخِرَتِكُمْ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمْ، وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمْ فَوَعِزَّتِي لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِي، فوَعِزَّتِي لَا أُخْزِيكُمْ وَلَا أَفْضَحُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِ الْحُدُودِ، انْصَرِفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ أَرْضَيْتُمُونِي وَرَضِيتُ عَنْكُمْ، فَتَفَرَحُ الْمَلَائِكَةُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِمَا يُعْطِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ إِذَا أَفْطَرُوا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » .

'হে আমার ফেরেশতারা, আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদের রমযান মাসের সিয়াম সাধনা এবং কিয়ামুল লাইল বা সালাতে রাত্রি জাগরণের বিনিময়ে প্রতিদান এই দিলাম যে তাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দিলাম আর আমি তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। তারপর তিনি বলেন, হে আমার বান্দা, আমার কাছে প্রার্থনা কর, আমার

ইজ্জত ও জালালের কছম, তোমাদের এই আখিরাতের সমাবেশে আমার কাছে যা-ই চাইবে আমি তা দিয়ে দেব। আর তোমাদের দুনিয়ার যার কথাই বলবে আমি তার প্রতি দৃষ্টি দেব। আমার ইজ্জতের কছম, আমি অবশ্যই তোমাদের ওই অপরাধগুলো ক্ষমা করব যা আমার পর্যবেক্ষণে তোমরা করেছিলে। আমার ইজ্জতের কছম, আমি তোমাদেরকে শাস্তিপ্রাপ্তদের সামনে লজ্জিত করব না, অপমানিত করব না। তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে (ঘরে) প্রত্যাবর্তন কর। তোমরা আমাকে সন্তুষ্ট করেছ; আমিও তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। তখন এই উম্মতের রমযানের সিয়াম সাধনা সমাপ্তিতে আল্লাহ জাল্লা শানুহূর প্রতিদান দেখে ফেরেশতুকূল আনন্দিত হবেন এবং তাঁরা সুসংবাদ পেয়ে আহ্লাদিত হবেন।[4]

এখন প্রশ্ন জাগে, এসব গুনাহ নেকী দ্বারা কিভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে? উত্তর হলো, মানুষ ভুল করে যখন কোনো পাপকাজ করে এবং সে অনুতাপ ও অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে যায়, আল্লাহকে

---

[4]. বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান : ৩৪২১; দিমইয়াতী, আত-মুতজিরুর-রাবেহ : ১৩৩। ইবনুল মুনযিরী রহ. বলেন, হাদীসটি ইবন হিব্বান সংকলন করেছেন কিতাবুছ-ছাওয়াব অধ্যায়ে, তেমনি বাইহাকী হাদীসটি সংকলন করেছেন ফাযাইলুল আওকাত অধ্যায়ে। হাদীসের সনদে এমন কেউ নেই যার 'যঈফ' হবার ব্যাপারে সবাই একমত। [আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব : ২/৬১]

কাতরভাবে ডেকে বলে, 'হে মাবুদ, অজ্ঞাতে অবহেলায় এ অন্যায় করে ফেলেছি। দয়া করে মাফ করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা শুধু মাফই করেন না, বরং এর বদৌলতে তার মর্যাদাও বৃদ্ধি করে দেন। এভাবে এ গুনাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায় এবং তার জন্য সুফল হিসেবে আবির্ভূত হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٧٠ ﴾

[الفرقان: ٦٩]

'তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ৬৯}

গুনাহ আমার কী ক্ষতি করবে?

ভারতের উত্তর প্রদেশে নাজমুল হাসান নামক একজন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সবসময় নেককার আলেমদের সোহবতে থাকতেন। তিনি একজন বড় মাপের আবেদও ছিলেন। তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাঁর একটি পংক্তি আমার ভালো লাগে এবং বারবার মনে পড়ে। যার অর্থ হলো-

অনুতাপ প্রকাশের পেয়ে গেছি ধন,

পাপ আর করবে কি অহিত সাধন।

অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা যেহেতু আমাদেরকে অনুতাপ অনুশোচনা ও রোনাজারি দান করেছেন, আর আমরা দু‘আও করছি, ‘হে আল্লাহ! আমার এ অপরাধ ক্ষমা করে দিন’ তাই এ গুনাহ ক্ষতি করতে পারবে না।

গুনাহ আল্লাহ তা‘আলারই সৃষ্টি। আর হিকমত ছাড়া কোনো কিছুই তিনি সৃষ্টি করেন না। গুনাহ তৈরির হিকমত হলো- গুনাহ করার পর তাওবা করলে, অনুতপ্ত হয়ে কান্নাকাটি করলে এবং ভবিষ্যতে না করার প্রতিজ্ঞা করলে এ তাওবার বিনিময়ে আল্লাহ তা‘আলা মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন, যা কল্পনায়ও ছিলো না।

আজীবন লড়াই চলবে

সুতরাং রাতে ‘মুহাসাবা’ করার সময় যখন জানতে পারবে গুনাহ সংঘটিত হয়েছে, তখন তাওবা ও ইস্তেগফার করবে। আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে, হতাশ হবে না। কারণ, জীবনটা এক ধরনের লড়াইয়ের নাম। মৃত্যু পর্যন্ত নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আর লড়াইয়ের অমোঘ নিয়ম হলো, কখনো তুমি জিতবে, কখনো প্রতিপক্ষ

জিতবে। তাই শয়তান তোমাকে পরাজিত করলে সাহস হারিয়ে বসে পড়ো না বরং পুনরায় সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করে শয়তানের সাথে লড়াই করো। 'সাহস না হারিয়ে পুনরায় মোকাবেলার জন্য দাঁড়ালে শেষ বিজয় আমাদেরই হবে' -এ ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًاۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٨٣ ﴾ [القصص: ٨٣]

'এই হচ্ছে আখিরাতের নিবাস, যা আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা যমীনে ঔদ্ধত্য দেখাতে চায় না এবং ফাসাদও চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য'। {সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত : ৮৩}

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْۖ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦۖ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٨ ﴾ [الاعراف: ١٢٨]

'মূসা তার কওমকে বলল, 'আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় যমীন আল্লাহর। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে তিনি চান

তাকে তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।' {সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ১২৮}

অগ্রসর হও, আল্লাহ স্বাগতম জানাবেন

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

'আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন'। {সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত : ৬৯}

'যারা আমার পথে জিহাদ করে' অর্থাৎ নফস ও শয়তানের সাথে তোমরা এভাবে লড়াই করবে যে, শয়তান তোমাদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে, আর তোমরা তার মোকাবেলা করছ এবং মরণপণ প্রচেষ্টায় ভ্রান্ত পথ থেকে বেঁচে চলছ, তবে আমার প্রতিশ্রুতি রইল যে, অবশ্যই অবশ্যই আমি প্রচেষ্টাকারী ও লড়াইকারীদের নিজের রাস্তার সন্ধান দেব।

আয়াতটি বুঝাতে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, শিশু যখন হাঁটা শুরু করে, বাবা-মা তখন তাকে চলতে ও হাঁটতে শেখায়। একটু দূরে দাঁড় করে

দিয়ে বলে ‘এদিকে এসো’। বাচ্চা যদি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে এবং সামনে পা না বাড়ায়, তাহলে বাবা-মাও দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে কোলে নেয় না। কিন্তু বাচ্চা এক পা ফেলে অপর পা ফেলতে পড়ে যেতে লাগলে বাবা-মা পড়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরে ফেলে এবং পরম স্নেহে কোলে নেয়। কারণ বাচ্চা তার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে।

এমনিভাবে মানুষ আল্লাহর পথে চলার চেষ্টা করলে, তার পথে পা বাড়ালে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন না, এগিয়ে এসে তাকে ধরবেন না, এমনটি হতেই পারে না। বরং এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ওয়াদা দিচ্ছেন, তোমরা চলতে শুরু করলে আমি এগিয়ে গিয়ে তোমাদের হাত ধরব। সরাসরি তোমাদের সাহায্য করব। অতএব সাহসিকতার সাথে নফস ও শয়তানের মোকাবেলা করো। তাঁর দরবারে হতাশার স্থান নেই। অন্যায় হলেও নিরাশ হয়ো না, চেষ্টা অব্যাহত রাখ। ইনশাআল্লাহ একদিন সফল হবেই।

সারকথা হলো, তুমি তোমার কাজ করো, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কাজ অবশ্যই করবেন। মনে রেখ, তোমার কাজে ত্রুটি হতে পারে কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতির কোনো সম্ভাবনা নেই। তুমি পা বাড়ালে তিনি পথ খুলে দেবেন। এ দিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, মরার আগে মরো আর হিসাবের আগেই হিসাব করো।

আল্লাহর সামনে কী জবাব দেবে?

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, মুহাসাবার একটি পদ্ধতি হলো, তুমি কল্পনা করো 'এখন তুমি হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছো, তোমার হিসাব-নিকাশ শুরু হয়েছে, আমলনামা পেশ করা হচ্ছে, তোমার আমলনামায় যেসব অপকর্ম ছিল সকলের সামনে তা উন্মোচিত হচ্ছে এবং আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করছেন- এ অপকর্ম তুমি কেন করেছ?'

এর উত্তরে তখন কি বলবে? আজ কোনো মৌলবী সাহেব যখন তোমাকে বলে, অমুক কাজ করো না, দৃষ্টির হেফাজত করো, সুদ-ঘুষ থেকে বেঁচে চলো, মিথ্যা বলো না, গীবত করো না, টিভি দেখো না, বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানাদিতে পর্দাহীনতা থেকে বেঁচে চলো। উত্তরে তোমরা তাদেরকে বলে থাক, আমরা কি করব, যুগটাই খারাপ। পৃথিবী উন্নতি ও সভ্যতার শিখরে পৌঁছে গেছে। মানুষ চাঁদে গেছে। আমরা কি তাদের থেকে পিছিয়ে থাকব? দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে পড়ব? বর্তমান সমাজে চলতে গেলে এসব না করে উপায় নেই।

এ উত্তর মৌলবীদের দিতে পারো। কিন্তু কিয়ামতের ভয়ংকর দিবসে মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর সামনে এ অজুহাত দেখাতে পারবে কি? বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করে বলো, এ জবাব যদি সেখানে না চলে এখানে কিভাবে চলবে?

আল্লাহর কাছে সাহস ও প্রত্যয় প্রার্থনা করো

তোমরা যদি আল্লাহর কাছে এ উত্তর দাও যে, ‘হে আল্লাহ! সমাজ ও পরিবেশের কারণে অপারগ হয়ে আমি গুনাহ করতে বাধ্য হয়েছি’। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, ‘অপারগ তুমি ছিলে না আমি ছিলাম?’ তোমরা উত্তর দেবে, ‘ওহে মাবুদ! আমিই অপারগ ছিলাম’। আল্লাহ তা‘আলা জিজ্ঞেস করবেন, ‘তবে তুমি তোমার অপারগতা দূর করার প্রার্থনা করোনি কেন? আমি কি তা দূর করতে সক্ষম ছিলাম না? আমার নিকট দু‘আ করতে, হে আল্লাহ! আমি অপারগ, আপনি আমার অপারগতা দূর করে দিন, নয়তো আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমাকে শাস্তি দেবেন না।

বলুন! আল্লাহ তা‘আলার এ পাল্টা প্রশ্নের কোনো উত্তর আছে কি? না থাকলে একটি কাজ করুন, আর তা হলো, নিজেদেরকে যে কাজ করতে অপারগ দেখছেন, চাই বাস্তব সম্মত অপারগতা হোক আর সামাজিক অপারগতাই হোক এ ব্যাপারে প্রতি দিন দু‘আ করুন, ‘হে আল্লাহ! আমার সামনে এই অপারগতা। আমি এ থেকে বাঁচার সাহস পাচ্ছি না। আপনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এ অপারগতা ও সাহসহীনতা দূর করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সাহস ও হিম্মৎ দান করুন। আমীন।

আল্লাহর দানের ভাণ্ডারে কোনো অভাব নেই

মোটকথা, আল্লাহর কাছে চাও, প্রার্থনা কর। অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত, আল্লাহর কাছে চাইলে তাকে অবশ্যই দেবেন। না চাইলে দেবেন কী? কবি বলেন-

রোগ যদি কেউ নাহি চেনে, চিকিৎসা তার নাই,

মনে রেখ রবের দানের, নাই তুলনা নাই।

রোগের ব্যথায় কাতরতা না থাকলে, গুনাহ থেকে বাঁচার আকুলতা না থাকলে তাকে চিকিৎসা দেবে কে? প্রার্থনাকারীকে দেয়ার জন্য আল্লাহর ভাণ্ডার সদা উন্মুক্ত।

সকাল-সন্ধ্যা যে চারটি আমলের কথা বলা হলো, এর ওপর আমল করলে আলোচ্য বাণী তথা 'মরার আগেই মরো, হিসেবের আগেই নিজের হিসাব করো' অনুযায়ী আমলকারী হিসেবে গণ্য হওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের তাওফীক দান করুন, ক্ষমা করুন এবং এসব কথার ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

(সংকলিত ও সংক্ষেপিত)